অন্তর্ভ্রমণ

অরূপরতন বসু

আজ এই বসন্তের রাতে শেখরের ঘুম আসছে না। সে জেগে আছে। এত রাতেই স্টোভ জেলে কফি তৈরি করল সে। কালো কফি, দুধ-চিনির ঝামেলা নেই। নির্ঝঞ্ঝাট। আজ অনেক রাত জেগে সে বোদলেয়ারের 'কারেসপন্‌ডেন্‌সেস' কবিতাটি পড়েছে, ভেবেওছে। বোদলেয়ার ইঙ্গিত করেছেন, প্রকৃতি এক মন্দির, যার চারটি স্তম্ভ কথা বলছে রহস্যময় ভাষায়। মানুষ, সে-ভাষার মর্মোদ্ধার করতে পারে, প্রতীক আর চিহ্নের নির্বিড় অরণ্য ভেদ ক'রে, যেমন ভূতাত্ত্বিক, বনেজঙ্গলে পাথরের নমুনা খুঁড়ে ভূস্তরের পাঠোদ্ধার করেন।

প্রতিধ্বনির যেমন ধ্বনি, তেমনই শব্দের পেছনে আছে নৈঃশব্দের জগৎ, যেখানে চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে পৌঁছনো যায়। এমন শব্দ আছে যা শিশুর মতো নিষ্পাপ, মাঠের মতো সবুজ, বাঁশরির মতো মধুর; আবার এমন ধ্বনি আছে যা থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ, রঙ, আলো আর সুগন্ধর ভিতর চলছে অবিরাম যাতায়াত; অনন্ত রাত্রির প্রান্তরে দূরাগত ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, এক বিশাল আলিঙ্গনের ভেতর অবিরাম যাতায়াত ক'রে চলেছে। এইসব শব্দেই আছে কবিতার রহস্য। বাড়ি, রাস্তা, সমুদ্রোপকূল, ঢেউ, গাছের সার,— এ সবকিছুই অপর এক অদৃশ্য জগতের প্রতিচ্ছবি, ভাবনার প্রতিফলন মাত্র। শব্দের নির্দেশ যদি অলিখিত নৈঃশব্দের দিকে হয়, তাহলে দৃশ্যের নির্দেশও অদৃশ্যের দিকে, ভাষার ভাবনার দিকে। কাল রাতের ভাবনা, শেখর এবার লক্ষ্য করে, আজ সকালেও তার মাথায় জেঁকে ব'সে আছে। একের পর এক এইসব ভাবনার ভাঁজ সে এখন নিঃশব্দে খুলে যাবে, খুলে দূর থেকে লক্ষ্য করবে। নিজের ভাবনাকে দূর থেকে লক্ষ্য করা, শেখরকে প্রায় নেশার মতো পেয়ে বসেছে। তার তো আর বেশি সময় নেই। 'বয়স তোমার কতো?' সে নিজেকে প্রশ্ন করে প্রায়ই, 'মুখ কেন ম্লান?' হ্যাঁ, মুখ তার ম্লান থাকে প্রায়ই। অনেক ভালোবাসাবাসি হ'লো, ঢের প্রণয় হ'লো, তবু প্রেম হ'লো কি? কী জানি কী হ'লো।

কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হওয়ায় চাকরি যাওয়ার আগেই সে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছে। সেদিন আর্টিস্ট শচীনের সঙ্গে দেখা। মদ্যপান, শচীন, খুব ভালোই ধ্বস্ত করেছে, যদিও আর্ট কতটা তার জবাব স্বয়ং মহাকালই দেবেন। কলেজ স্ট্রীটে চায়ের দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে ম্লানমুখ শেখরকে ভাঁড়ের চা খেতে দেখে, সে চোখ মটকে বলে, 'কী হে, তুমি নাকি চাকরি ছাড়োনি, ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছো?'

'ঠিকই শুনেছো,' সভয়ে বলে শেখর।

'আরে ছো ছো রিটায়ারমেন্ট! তা-ও ভলান্টারি! সে-ই চাকরিও করলে না, আবার

ছাড়ার সাহস-ও দেখালেনা ! এই যে আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লাখ দেড়েক আর সবকিছু মিলিয়ে লাখ তিনেক টাকা নিয়ে লাথি মেরে চাকরি ছেড়ে দিলাম—এবার দেখো—'

'তা তুমি পারবে, তোমরা প্রতিভাবান, আমি···আমি···আমি তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের মুখই দেখতে পেলাম না—ধার নিতে নিতে শেষকালে দেখলাম কয়েক হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে—কোনোমতে সভয়ে সলজ্জে কথা শেষ করে শেখর।

'ধার ?' প্রায় হুঙ্কার ছেড়ে শচীন জ্বলন্ত চোখে শেখরের দিকে তাকায় ; তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় ও ততোধিক তাচ্ছিল্যে, বোতল হিপ পকেটে পুরে দ্রুত ফুটপাথ পেরিয়ে যায়।

তবু শচীনকে বিচার করতে চায়না শেখর। এক বহুজাতিক রঙকোম্পানীর বিজ্ঞাপন আঁকার লোভনীয় চাকরি ছেড়ে আজ শচীন যদি অদৃশ্যের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে কিছু দৃশ্য তুলে আনতে চায় তো আনুক না। এ-ও তো এক প্রার্থনা, যা ঘাস থেকে শালবন থেকে হাওয়ার স্রোতের মতো উঠে চলে যায় নক্ষত্রের আগুন লক্ষ্য ক'রে। সেও কি তা চায়নি ? নাকি বড় দেরিতে সে এসব ভাবছে। টাকার মোটা অঙ্কটা প্রায় সবই খোয়া গেছে শেয়ারমার্কেটের দুই জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে। তারপর বাড়ির আর কারও সঙ্গেই বিশেষ বাক্যালাপ নেই। খাওয়াদাওয়ার পাট বাইরে, কিছু টাকা কোনোমতে এখান ওখান থেকে যোগাড় ক'রে বাড়িতে দেয়, কেউ তাকে খেতেও ডাকে না। ভালোই হয়েছে, নিজেই মাঝে মাঝে চা-কফি ক'রে নেয়। কীভাবে, কতদিন এভাবে চলবে তাও জানে না। এই অবসর, যা সে ভেবেছিল কিছুটা লিখে, কিছুটা ভেবে, কিছুটা স্তব্ধ হ'য়ে থেকে কাটিয়ে দেবে ; তা আর সেভাবে পারল কোথায় ? একসময় তারও গল্প-উপন্যাস লেখার সাধ যে ছিল না, তা নয় ; অনেকটা সময়াভাব, অনেকটা রক্তক্রান্ত অবসাদ, কিছু ঘৃণা, কিছু তিক্ত আত্মগ্লানি, কিছু শরীর ও ইচ্ছার অপরিণামদর্শী ক্ষয়, কিছু আত্মকলহ ও সংশয় এইসব আস্তে আস্তে দীর্ঘ বিশবছর ধরে তাকে ফেঁড়ে দেয়ার পর কিছুই হ'ল না তার। কিছু হওয়ার কথা ছিল কি ?

মনে আছে, কেপ কমোরিনের কথা। ঐ অন্তরীপ থেকে সামান্য দূরে, সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে আসা ছোট্ট একটা ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর এক স্মৃতিসৌধের নিচের প্রকোষ্ঠে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহার অন্ধকারে তুমুল হাওয়া, জলোচ্ছ্বাস আর ঢেউয়ের অবিরাম ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধাক্কায় বিদীর্ণ হয়ে যেতে যেতে নিজেকে মনে হয়েছিল তার, অনন্ত আঁধারের কালো স্রোতে ভেসে যাওয়া এক কণা উজ্জ্বল সোনালি। এতবছর পর, এই প্রথম নিজের ভেতর কোথাও কোনো আলো ছিল, আলো আছে তা টের পেয়েছিল শেখর। চারপাশের সমুদ্র আর হাওয়ার গম্ভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধাক্কায় কাঁপতে থাকা ঐ অন্ধকার গুহায় এক জ্যোতির্ময় স্পন্দন যেন সেদিন তার শরীরময় ছড়িয়ে পড়েছিল, ঐ এককণা উজ্জ্বল আলো আর স্পন্দন শরীরে নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল শেখর তার হোটেলে। জানালার সামনে দক্ষিণের আকাশে তুলারাশির উজ্জ্বল

দুই নক্ষত্র সীমাহীন অন্ধকার জলের উপর জ্বলতে জ্বলতে পশ্চিমের ঢালু আকাশ বেয়ে নেমে যেত দিগন্তের নীচে অশ্রুর দুই উজ্জ্বল ফোঁটার মতো, মাতৃতীর্থের কালো পাথরে তৈরি কারুকার্যখচিত দীর্ঘ নির্জন তোরণ দেখে সে ভাবত কোথায় চলেছে ঐ ঊর্ধ্বে অপার নক্ষত্রলোক, কোন ভাষার অতীত, শব্দ-নৈঃশব্দের অতীত অব্যক্তের অন্তস্থলে। তুতিকোরিনের সমুদ্রোপকূলে মাইল মাইল অন্ধকারে জ্বলতে থাকা একের পর এক নুনের স্তূপ দেখে মনে পড়েছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে কোথাও এইভাবে পরপর ঘটনার সার নিঃশব্দে জেগে আছে; যেন ঐ আকাশ, ঐ সমুদ্র একাকার হয়ে ভেঙে পড়ছে বিশাল এক ঘূর্ণ্যমান বলয় পেরিয়ে অদৃশ্য অতল এক গহ্বরের ভিতর—সময় যেখানে নেই, আলো যেখানে নেই, স্থানকাল নেই, স্থানকালের বঙ্কিম জ্যামিতি যেখানে নেই, কিছু নেই, শুধু হওয়া-না-হওয়া যেখানে একাকার হয়ে একটি বিন্দুতে মিশে ঊধাও হয়ে গেছে কোন অজ্ঞেয় রহস্যলোকে—এরকমই কি তার মাথা—এক অদৃশ্য গহ্বর হয়ে জেগে আছে, মহাকাশে নয়—এই ভাঁড়, ইস্পাত আর কংক্রীটের মাইল মাইল প্রান্তরে···চারপাশ থেকে শুধু আলো শুষে নিয়ে অন্ধকার হয়ে থাকা, গতি সংঘর্ষ শক্তি স্পন্দন শুষে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকা, এই তার কাজ, এই তার পরিণাম···

অথচ, এও ঠিক যে, তার মাথায় এককণা সোনালি—সে টের পায়—ঘুরে চলেছে। কখনো দীর্ঘ রশ্মি পাঠিয়ে সে নেমে আসে ঝর্ণার মতো, কখনো ফোয়ারার মতো উঠে যায়; শরীরের ভেতর আরেক শরীর, অথচ এ শরীর নয়, শুধু এককণা আলো; শুধু ঢেউ। কী এ? সেকালের কোনো শ্যামলী শক্তি? প্রাচীন লুপ্ত পূজাবিধির? উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে নাকি সে? অন্তত সন্তোষকে বললে সে যে তা-ই বলবে তা ঠিক।

একসময় সন্তোষদের সঙ্গে সে আড্ডা মারত শ্মশানের পাশে কালীবাবুর চায়ের দোকানে। দোকানের পাশে, মানে ঠিক পাশেই নয়, দোকানের ধার দিয়ে একটা রাস্তা, রাস্তার ওপাশে কিছু পাম, সুপারি ও ফুলগাছ লাগানো ছোট্ট একটা মাঠ। কিংবা ঠিক মাঠ নয়, মাঠকে বাগান বানিয়ে তোলার চেষ্টা কিছুদিন চালিয়ে যাওয়ার পর হাল ছেড়ে দিলে যা হয়, তা-ই। মানে মাঠ ও বাগানের মাঝামাঝি একটা আধাখ্যাচড়া অবস্থা। তারই পাশে, একদিকে, ইলেকট্রিক চুল্লী, অন্যদিকে সনাতন কাঠের চিতা। এই চিতার আগুনই, রাত্রে, শেখরদের আড্ডা থেকে চোখে পড়ত। একেকদিন আড্ডার মাঝখানে উঠে গিয়ে সে লক্ষ্য করেছে ইলেকট্রিক চুল্লীর দোরগোড়ায় তেমন ভীড় নেই, বাল্ব খোয়া যাওয়ায় জায়গাটা অন্ধকার, আর অন্ধকারেই বিনীতভাবে খাটিয়ায় শুয়ে আছে কিছু প্রায়-নিরুপায় পরিত্যক্ত শব। কোনোদিন তিতিবিরক্ত বৃদ্ধের শব, কোনোদিন হাসিমুখ বালক, কোনোদিন বা শান্তবিষণ্ণ মুদিতচক্ষু তরুণী, কোনোদিন বা মাথায় ভয়াল ব্যান্ডেজ বাঁধা একরোখা তরুণ। মনখারাপ করার কথা নয়, উদাসীন হওয়ারও কথা নয়। শুধু দৈনন্দিন জীবিতের জগতের পাশে মৃতের সমান্তরাল সমাবেশ, ঘুম ও জাগরণের মতো, অথবা দুই গোলার্ধের মতো, পরস্পরকে ছুঁয়ে রয়েছে। আড্ডায় ফিরে আসার পর অবশ্য বোঝা যায় সবই ঠিক আছে, 'নির্জ্জন মন ব'লে কিছু নেই',

সন্তোষ বলে চলেছে, 'সার্ত্র-এর মতে তা হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়ার মতো। মানে রহস্য আছে তবে তা ভেদ করা যায় গোয়েন্দার মতো একের পর এক যুক্তির সূত্র সাজিয়ে।'

এদিকে নতুন মড়া এসে যাওয়ায় দোকানে তোয়ালে ও গামছা কাঁধে ছোকরা খদ্দেরদের ভীড় বাড়ে, ধার-বাকীর খদ্দেরদের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে কালীবাবুর ছেলে এবার নগদ খদ্দেরদের দিকে মন দেয়। কালীবাবুর ছেলেকে নিয়েই ঝামেলা। কালীবাবু মাঝে মাঝে হঠাৎই উধাও হয়ে যান, অনেকদিন পর শোনা যায় তিনি অমুক মহাশ্মশানে সাধনা করছেন। আবার কিছুদিন পর তাঁর আবির্ভাব, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, রক্তচক্ষু, অতি সমাদরে সকলকে শুধু চা নয়, কারণবারি দ্বারাও আপ্যায়ন করেন। সঙ্গে গঞ্জিকা তো আছেই। যে কোনো শ্মশানের ধারে আড্ডা মারার এই এক সুবিধে। তবে এ সুবিধে বেশীদিন থাকে না, আড্ডাও নয়। সন্তোষের কথা ভাবতে গিয়েই আড্ডার কথা মনে পড়ে শেখরের। গুপ্ত সাধনা থেকে ফেরার পর রক্তচক্ষু কালীবাবু মাঝে মাঝেই গঞ্জিকার কলকে আড্ডার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'এ মহাশ্মশানে কে আর আসবে, রামকেষ্টর মতো মা'র সেবক ছাড়া—' সন্তোষ নিরুত্তর তাঁর হাত থেকে গঞ্জিকার কলকে টেনে নিয়ে যথোচিত গাম্ভীর্যে সেবন করার পর কালীবাবুকে ফেরৎ দিয়ে ফিশফিশ করে শেখরকে বলত, 'বুলশিট! রামকৃষ্ণর আসলে মৃগীরোগ ছিল, ওসব সমাধিফমাধি হচ্ছে এপিলেপটিক ফিট।'

ঠিক এহেন সন্তোষকে, তার মাথায় ঘুরন্ত সোনালি আলোর ঝর্ণার কথা বললে যে কী মারাত্মক ফল হ'তে পারে তা আর বলার দরকার নেই। একবার, তবু শেখর চেষ্টা করেছিল, 'আমার মাথায় ; মানে কানের পাশটায়, ঘাড়ের কাছাকাছি, একটা কেমন যেন চিনচিন, ভাইব্রেশন…'

'ভাইব্রেশন?' খুবই উদ্বিগ্ন মুখে তাকায় সন্তোষ, 'এখনি ই এন টি স্পেশালিস্ট ডক্টর সান্যালকে দেখাও, কানের ভেতর কিছু হ'তে পারে, আবার লো-প্রেশারও হ'তে পারে।'

'আমার মনে হচ্ছে…মানে অন্য কিছুও তো হ'তে পারে…' সভয়ে বলে শেখর।

'অন্য কিছু?' চাপা হুঙ্কার ছাড়ে সন্তোষ, 'তাহলে ইমিডিয়েটলি নবীনের কাছে যাও, ও বিহেভিয়ারিস্ট—ওরা ড্রাগ দিয়ে সব মানসিক বিকার সারিয়ে দেয়। আমেরিকায় তো এসব হ'লেই লোককে পাগলা গারদে পাঠায়।'

'যেমন গীন্সবার্গকে পাঠিয়েছিল—ব্লেকের গলা শোনার জন্য?'

'তোমারও তাই হচ্ছে নাকি?' ঠা-ঠা ক'রে হেসে ওঠে সন্তোষ, 'যাও যাও বাড়ি যাও, ভাল ক'রে ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে একটা ঘুম দিয়ে এসো দেখি—পেট টেট পরিষ্কার আছে তো—'

'আচ্ছা আজ তাহলে।' শেখর উঠে দাঁড়ায়। 'ঠিক আছে, এসো', বলে সন্তোষকে সযত্নে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, পারলে যে তাকে ঘোলা কিংবা রাঁচী পর্যন্ত এভাবে

পৌঁছে দেবে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

কাজেই নিঃশব্দে, বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলের কাছ থেকে স'রে এসে শেখর এখন একা তার নিজের মাথা আর শরীর লক্ষ্য করে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই যে ঘর, তার জানালা, চেয়ার টেবিল বিছানা—এসব কি এই প্রথম দেখছে সে? মহাসময় পেরিয়ে বীজ হ'য়ে এই প্রথম সে কি মাতৃগর্ভে ভেসে এসেছিল? এই দিন ও রাত্রি, আলো-অন্ধকারের অবিরাম যাতায়াতের ভেতর, এক মধ্যবয়স্ক নক্ষত্রের স্থানকালের বঙ্কিম জ্যামিতির ভেতর ঘুরতে থাকা স্পন্দমান এই গ্রহের পিঠে কোথা থেকে ভেসে এলো সে?

অন্য কোনো মহাবিশ্বলোকে, নক্ষত্রলোকে সে কি ছিলো কোনোদিন, অন্য কোনো শরীরে? যদি কোনো সুপারনোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণে এই সৌরলোকের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তবে তো বহুদূরে নক্ষত্রলোকের পরমাণু আছে তার শরীরে যেমন চারশকোটি বছর আগে এ-গ্রহে প্রাণের আবির্ভাবের পর যে এককোষী প্রাণী প্রোকারিয়টের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই একই জীবাণু তার শরীরে আছে জীবকোষের শক্তিকেন্দ্রে মিটোকোনড্রিয়া হিশেবে। পরমাণু, ধাতু, খনিজপদার্থ, জীবাণু, মাছ, উদ্ভিদ, পশু আর সমুদ্রের নুন দিয়ে গড়া তার রক্তমাংস শরীরে যেমন এসব কিছুর তরঙ্গকম্পন ব'য়ে চলেছে, তেমনই নক্ষত্রচুল্লীর আগুন, মহাবিশ্বলোক সৃষ্টির আদিম ঢেউ, এমনকি তারও আগেকার আদিমতম অপার নিঃশব্দ তরঙ্গ তার রক্তস্রোতে নেই, মাথার নিউরোন বিস্ফোরণে নেই, নির্জ্ঞান স্বপ্নের জগতে নেই, জাগরণে নেই, এমন কথা কে জোর করে বলবে?

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল

এক নক্ষত্রলোক থেকে অপর নক্ষত্রলোকে অনন্ত রাত্রির ভিতর ভেসে যেতে যেতে কোন নির্জন বীজ থেকে নেমে এসেছিল সে, শেখর? 'না না, এ ঠিক নয়,' সন্তোষ প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছিল সেদিন, 'জীবনানন্দর ইতিহাসচেতনাটা আগে বোঝো। তা না তুমি বলছ নক্ষত্রচেতনা,—'

'কবির তো ইতিহাসচেতনা থাকবেই, তবে শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি মহাবিশ্ব চেতনা আর কি', বেশ সলজ্জে বলে শেখর, 'কবিতার পর কবিতায় নক্ষত্রের কথা, নিশ্চয়ই জীবনানন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না, মানে এ্যাস্ট্রোলজিতে আর কী! আবার নিছক এ্যাস্ট্রোনমি-ও নয়, আবার নিছক ইতিহাসেও কি হবে? ঐ হাজার হাজার শূকর শূকরীর আর্তনাদ, যদিও দাঙ্গার কথা আছে, আহিরীটোলা; ভিকিরি, মহাযুদ্ধের কথা আছে—কিন্তু সে সবই বোধহয় নক্ষত্রের পথে যেতে যেতে—'

'পথ ভুলে পৃথিবীর ক্ষেতে আসা?' সন্তোষ বেশ গম্ভীরভাবে বলে।

'হ'তে পারে, মানে ইতিহাস স্তব্ধ হ'লে, তার অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতো যেন—'

'জ্বলে ওঠে হৃদয় ? না না মিস্টিফাই ক'রো না, জীবনানন্দে মিস্টিসিজম নেই।'

'নেই ?'

'থাকলেও ক্ষতিকর ভাবে নেই।'

'তাহলে বোধহয় ভুল বুঝে সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে মশাইরা অনেকদিন ভদ্রলোককে একঘরে ক'রে রেখেছিলেন।'

'যা ভুল হয়েছে তা হয়েছে। এখন নতুন ক'রে ভাবতে হবে। পুনর্ভাবনা। ইতিহাস আর 'সমগ্র'র দিক থেকে নতুনভাবে ভাবতে হবে।'

'লোকসমগ্র ?' শেখর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তাছাড়া আর 'সমগ্র' কিছু আছে ?'

'নেই ? মানে সেই যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ে পড়া যায় ঊর্ধ্বে অমৃতলোকে তাঁর তিনভাগ আর বাকী একভাগ পৃথিবীতে। নইলে শুধু লোকসমগ্র শেষকালে হিটলার-সমগ্র হ'য়ে যেতে পারে তো···আচ্ছা থাক সেটা নয় বাদই দেয়া গেল। কিন্তু লোকসমাজ তো আছে পৃথিবীতে, অবশ্য অন্য গ্রহেও থাকতে পারে—কিন্তু সে থাক, পৃথিবী আছে আমাদের সৌরমণ্ডলে, সৌরমণ্ডল আছে আমাদের গ্যালাক্সিতে আর গ্যালাক্সি—মানে এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে আমাদের মহাবিশ্বে—'

'আঃ থামো !' সন্তোষ হাত নেড়ে থামিয়ে দেয় শেখরের বাচালতা, 'এই মহাবিশ্বেরও ইতিহাস আছে, এমনকি সময়েরও। মানে সময়ের ইতিহাস আছে জানো ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আজকাল', শেখর সন্তর্পণে বলে, মানে প্রায় হাজার বা দুহাজার কোটি বছর আগে কোনো একটা সময় হঠাৎ 'সময়' পাল্টে গেছিল স্থান, মানে স্পেসে, তারপর স্পেসটা হঠাৎ ফুলে ফেঁপে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা-ই, তাহলে আর মহাবিশ্বের শুরু বা শেষ কোথায় ? যেমন উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু—এর কোন জায়গা থেকে পৃথিবীর শুরু বা শেষ ? একে বলে নো বাউন্ডারী সিচুয়েশন, স্পেসকমই মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, চিরকাল 'ছিল'—অবশ্য কাল্পনিক সময়ে—মানে অঙ্কের একটা বিশেষ কায়দায়।'

'তাহলে বাস্তবে ?—মানে বাস্তবে বিশ্বের শুরুই হয়নি ?' শেখর ভয়ে ভয়ে বলে।

'ওসব জটিল অঙ্কের ব্যাপার, তুমি বুঝবে না। বাস্তবে শুরু হয়েছিল—শেষও হবে—তবে তাতে কিছু এসে যায় না। শুধু অঙ্কের হিসেবে এর শুরু বা শেষ নেই।' সন্তোষকে নিশ্চিন্ত দেখায়।

'বলো কী ? কল্পনা আর বাস্তব সব একাকার হ'য়ে গেল যে—মানে দেখা যাচ্ছে কল্পনাই বেশি সত্যি !'

'ওসব অঙ্কের ব্যাপার—জটিল অঙ্কের ব্যাপার'—সন্তোষ গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বলে, 'আর তাছাড়া এটা এখন নেহাতই প্রস্তাব—এর অঙ্ক এখনো চলছে, কিছু প্রমাণ হয়নি। কেউ সঠিকভাবে জানে না মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হ'লো—'

'তাই বলো'। শেখর ধীরে ধীরে বলে, 'আমি শুনেছি বিন্দু থেকে শুরু হ'লে নাকি

বিজ্ঞানের সব নিয়মকানুন ভেঙে যায়—মানে যাকে নাকি দুর্লঙ্ঘ্য শাশ্বত প্রাচীর বলে—যার ওপারে কোনো বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে না—তাই ঐসব উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর কথা হচ্ছে—'

'এইসব নিয়ে তুমি আর মাথা নাইবা ঘামালে', সন্তোষ বলে, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাই ঠিক মতো রাখতে পারলে না,—এখন আবার আমার খুব স্ট্রেনের মধ্যে চলছে—না না, তুমি যে ধারটা নিয়েছিলে, সেটার কথা ভাবছি না!'

'আঃ বাঁচালে ভাই।' শেখর উঠে পড়ে, আবার তার ভীড় আর ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে হাঁটা শুরু। কোথায় চলেছে সে? স্বপ্নের ভিতর দিয়েও তো সে এভাবে হেঁটেছে। মনে আছে একরাত্রে, স্বপ্নে, নিজের প্রায় প্রৌঢ় লোভী ক্ষয়ে যাওয়া পুড়ে যাওয়া মুখের সামনে নিজেরই আরেক দীপ্ত মুখ দেখেছিল, শেষকালে নিজেই গুলি করল আয়নার অপর পারের প্রৌঢ় মুখকে।

কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে যদি বিশেষ তফাৎ না থাকে, যদি গণিতের কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে গড়া যায় এমন বিশ্ব যা বাস্তবের সমান্তরালে অনেক বেশি সত্য হ'য়ে ওঠে, তাহলে জাগরণ আর ঘুমের মধ্যেও তেমন দূরত্ব রইল কোথায়, মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেই বা তেমন কী? হয়ত স্বপ্নের জগতে তার সেই জননীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, যে তার মৃত্যুর পর জননী হবে। শোনা যায় মহাকাশে এমন কিছু কালো গহ্বর আছে যেখানে সময় নেই, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎও নেই, হয়ত সেরকমই, সেরকমই সবকিছু একাকার হ'য়ে আছে কোথাও। ঐ কালো গহ্বরের চার পাশে ঘুরতে থাকে জ্যোতির্ময় এক বলয়, যাকে বলা হয় 'ইভেন্ট হরাইজন'—ঘটনার দিগ্‌বলয়—ঘটনার সার সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, কেননা তার সীমানা পেরোলেই আর কিছুই থাকে না, এমনকি সময়ও নয়।

সেরকমই আজ তার মাথার চার পাশে ঘটনার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন, শেখর টের পায়··· কত বছর, কত শতাব্দী আগে? এই নক্ষত্রলোকে কী?···শীতের মাঝামাঝি হ'লেও বৃষ্টি কুয়াশায় ভরা ডিসেম্বরের দুপুর, কনকনে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টার মাঝে মাঝে হা হা ক'রে উঠছে রাস্তাঘাট, গাছপালা। শ্যামবাজারে নামতেই শেখর দেখল সীতা, রক্তাভ শাল গায়, আনত মুখ, মাথায় ছোট একটা ছাতা—বুক-স্টলের নিচে দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টির ছাট থেকে কোনোমতে মাথাটা বাঁচিয়ে শেখর সীতার কাছে এগিয়ে যায়। তাকে দেখেই হঠাৎ চমকে ওঠে সীতা, 'আপনি?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাকে দেখেই নেমে এলাম—ট্রাম থেকে।' শেখর স্পষ্টভাবে বলে।

মুহূর্তের মধ্যে সীতার মুখে সামান্য রক্তাভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়: তবু মুখে নিছকই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে বলে, 'কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'এ্যাকাডেমীতে, নীরদবাবুর ছবি···'

'শেষ বসন্ত ?' সীতার মুখে কৌতুক।

'বোধহয়।'

'চলুন, আমি-ও যাই,' সীতা এগিয়ে আসে।

'প্রকাশ ?'

'এখানে নেই,' সীতা স্থির গলায় বলে, 'লন্ডনে পোস্টাল স্ট্রাইক চলছে—অনেকদিন কোনো চিঠিও নেই।'

'চিঠি নিয়মিত লেখে ?'

'হ্যাঁ। নিয়মিত। আফ্রিকা, ভিয়েৎনাম, আয়ারল্যান্ড এই সব নিয়ে আর কী। ব্যক্তিগত আবেগ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'বুঝেছি', বলে শেখর। তারপর তারা দুজনেই এগিয়ে যায়। ডবলডেকারে ওঠে। তারপর এ্যাকাডেমী। শীতের অপরাহ্ণে, ক্যাসুরিনা এভিনিউ ফেরার সময় একটু আলোকিত হ'য়ে ওঠে, হঠাৎ মেঘ স'রে যাওয়ায়, বৃষ্টি থামায় সার্কুলার রোডকে দেখায় বিদেশী পিকচার পোস্টকার্ডের ছবির মতো। তারপর ল্যান্সডাউন রোড ধ'রে রাসবিহারী। তখন কতো দীর্ঘপথ হেঁটে গেছে তারা, শীত বর্ষা রোদ মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—একবার রাসবিহারী এভিনিউর দুপাশে গাছের সার হঠাৎ ঝড়ের আগেকার মেঘভাঙা আলোয় জ্বলে উঠছে দেখে সে ছুটে চ'লে গেছিল সীতাদের বাড়ি। দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি···মাটি থেকে ধোঁয়া উড়ছে সোঁদা গন্ধ উঠছে অনেকটা সীতার ঠোঁট, কখনো কখনো সমস্ত শরীর থেকে যেমন অদ্ভুত সুগন্ধ উঠে আসত।

আবার এক শীতের সকাল, কবে, কতবছর আগে মনে নেই···নীল ঝোলাকোট গায় সে চলেছে দাদুর হাত ধ'রে ইশকুলে—আজই ভর্তি হবে।

অসম্ভব ফর্সা, (তখন মনে হয়েছিল মুখে রঙ মাখা) মেয়েলি ধরনের এক মাস্টার মশায় বললেন, 'স্লেটে নাম লেখো।'

নাম লিখতে গিয়ে একটা বানান ভুল করল, তবু তাতেই ভর্তি হওয়া গেল। পরে জেনেছিল, দেখেও ছিল, ঐ মাস্টারমশায় গোপেনবাবু মাস্টারমশায়দের নাটকে মেয়ে সাজেন। চমৎকার মানায়। তখন মফস্বলের যাত্রার দলে, নাটকের দলে ছেলেরা মেয়ে সাজে। ডিস্টিক্ট লাইব্রেরির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যে সুন্দরী নায়িকাকে দেখে গোপন অনুভূতি (যদিও পুরুষালি গলায় মেয়েদের গান শুনে স্বপ্নভঙ্গ) তাকেই একদিন দেখতে পায় দিব্যি চকচকে দাড়িগোঁফ কামানো মুখে শাদা সার্ট গায় পোস্টাপিসের কাউন্টারে খামপোস্টকার্ড বিক্রিরত। দেখে যতটা স্তম্ভিত, প্রায় ততটাই হাসি। তবু মফস্বলের শীতকালে ঝরাপাতার স্তূপ গাছের সারির নিচে, ভোরের রৌদ্র কুয়াশায় মরশুমী ফুলের ভিড়, প্রজাপতির ওড়াউড়ি, পাখির ডাক, খেলা, চড়ুইভাতি, শিউলিগাছে শুয়োপোকার পুরু আস্তরণ, শিশিরের ফোঁটায় তাদের ধূসর রেশম চকচক ক'রে ওঠে, সাবানের বাক্সে সারি সারি ফুটো ক'রে (নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে)

শুঁয়োপোকা পোষা, তারপর হঠাৎ একদিন তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি হ'য়ে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসা, উড়ে যাওয়া গোল বারান্দার রেলিঙ থেকে। হাওয়ায় ফুলে ওঠা পালের মতো রঙিন শাড়ির ওড়াউড়ির মধ্য দিয়ে তাদের উড়ন্ত নীল সোনালি কালো ফুটকি দেয়া ঝলমলে পাখনার মিছিল···হয়ত শরীরও এভাবে একদিন পাল্টে যাবে আগুনের শিখায় ; মানুষ পাল্টে যাবে আলোয়। উন্মাদ আশ্রমে বেশ কয়েকবার গেলেও আর্তের বিশ্বাস এরকমই ছিল, নাটকের মধ্য দিয়ে এ-পরিবর্তন ঘটতে পারে। আর্তের মেক্সিকো ভ্রমণ—ইনকা এ্যাজটেক মায়া লুপ্তপূজাবিধি পুনরাবিষ্কারের প্রাণান্তকর চেষ্টা—এসবই সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা। র‍্যাঁবো দেখেছিলেন একেকটি স্বরবর্ণের একেক রঙ, এদেশেও অক্ষরকে বর্ণ বা রঙ হিশেবে দেখা হয়।

ইন্দ্রিয় বিপর্যয় নয়, ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করতে পারলে অদৃশ্যকে দেখা, অশ্রুতকে শোনা, সম্ভব। এরকম ইঙ্গিত শেখর পরে লক্ষ্য করেছিল এক রহস্যময় ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনীগ্রন্থে, যিনি এদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটিয়ে পরে চলে যান শরীরে নিহিত আলোর অভ্যুত্থানের দিকে।

দক্ষিণের এক সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট্ট ঔপনিবেশিক শহরে ছিল সেই নির্বাসিত বিপ্লবীর আস্তানা, যা ক্রমশ নৈঃশব্দের অন্তস্থলে পৌঁছে নীলিমার একটি প্রদীপ থেকে সহস্র প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান পাঠায়। সে আহ্বান হয়ত বা আজো শোনা যায় কংক্রীটে বাঁধানো চত্বর, খিলান আর স্তম্ভের সার পেরিয়ে অদূরের নীলাভ সবুজ ধূ-ধূ সমুদ্রের উতরোল কল্লোলে। চওড়া এভিনিউ, মাঝখানে বুলভার, সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া দীর্ঘ ব্রিজের সংলগ্ন জেটি, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'হার্বার'। তখন শেখরের বোদলেয়ার মনে পড়েছিল বই কি :

I have long lived beneath the vast colonnades
Dyed by the suns marine with myriad lights
Their mighty pillars, splendid & erect
Basaltic grottoes every night displayed

আজ এতদিন পর আবার সেই কবিতার লাইন···হে সমুদ্র, মানুষের হৃদয়ও কি তোমার মতো নয়, একদিকে উত্তাল ঢেউয়ের নিচে অমেয় গহ্বর, অন্যদিকে অবিরাম উত্থান। স্বপ্নের মধ্যে কি একবার ভূমধ্যসাগর দেখেছিল শেখর, তার নীল জলরাশির পাশে শুভ্র বাড়ি, জানালা, ঘরদোর, শুভ্র স্ফটিকের বাড়ি, যা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেতে পারে চারদিকে। অন্তত দুটি স্বপ্ন শেখরের মনে আছে, একটি এক আশ্চর্য নীলাভ নদী বা সমুদ্রের ভিতর কোনো প্রবাল দ্বীপ, যার চারদিকে শুধু নীল আলোর দ্যুতি, নীল শাদা ঢেউ আর ফেনার পুঞ্জ, প্রস্রবণ, ফোয়ারা আর স্রোতের খেলা—যতদূর দেখা যায় শুধু আলো আর অনন্ত জলের খেলা—কিন্তু এতটুকুও ভয় করেনিতো!

আর দ্বিতীয়টি, নিশীথের গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এক গভীর

কালো পাহাড়ের চূড়ার দিকে। মধ্যরাত্রের বিশাল কালো, শুধু নক্ষত্রের অসংখ্য স্থির অগ্নিশিখা নিঃশব্দে জ্বলে যাচ্ছে, চারদিক জনহীন, অথচ ভয়ের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, শুধু একা সে হেঁটে যাচ্ছে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে চূড়ার দিকে, আরেকটু দূরেই যেন সীমান্ত, কীসের সীমান্ত? কীসের চূড়া?

এসব স্বপ্ন আজো মনে পড়ে, হয়ত ঐ অনন্ত নীল আলোর ঢেউ ও প্রস্রবণে অতি চেতনার ইঙ্গিত, হয়ত মধ্যরাত্রির গম্ভীর কালো পাহাড়ের চূড়ায় আছে অবচেতন, নিজ্ঞান মৃত্যুর সীমান্তে স্তব্ধ উঠে যাওয়ার নির্দেশ।

The waves rolled heaven's likeness infinite
And merged in solemn mystic serenade
The rich and mighty harmonies they made
With all the sunset colours in my sight.

গুবের এভিনিউ আর জান দার্ক পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াত সে। সামনের সমুদ্রে মাছধরার লঞ্চের উড়ন্ত পতাকা কাঁপছে স্পন্দিত হৃদয়ের মতো, পাশেই কফি হাউস। তার খোলা ছাদে চেয়ার টেবিল পাতা। কফি খেতে খেতে চোখে পড়ে নিচেই সমুদ্র, এখন আর বাইরে থেকে জাহাজ আসে না। একসময় ফ্রান্স থেকে সোজা এখানে জাহাজ আসত। সেভাবেই এসে পৌঁছেছিলেন ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন তীর থেকে এক পুণ্যনারী, যাঁর স্বপ্না ছিল নক্ষত্রলোক থেকে অথবা নক্ষত্রলোকের অতীত থেকে দিব্য আলোর গোলক পৃথিবীতে নেমে এসে তৈরি করবে এক আলোর উপনিবেশ।

মানচিত্রে আঁকা ভূলোক মোমের আলোর নিচে কত বড়, অথচ স্মৃতির ভিতর কত ছোটো—সকলেইতো কোনো না কোনো ভ্রমণে বেরোয়; কেউ স্মৃতিতে, কেউ স্বপ্নে, কেউ দেশভ্রমণে। কিন্তু শরীরের ভেতর আত্মার দিকে রয়েছে আরেক ভ্রমণ, জীবকোষের ভেতর রয়েছে তার অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র, গহ্বর। গহ্বরের ওপাশে আছে আরেক আলো, আরেক শহর, এক বহুমাত্রিক 'স্থান' সময় যেখানে নেই, অর্থাৎ মৃত্যু নেই; যেখানে সময় একাকার হ'য়ে আছে নিছক সম্ভাবনার মতোই স্থানের বঙ্কিম অনন্তের ভিতর।

এই ভ্রমণ আর্তির মতো নাটকীয় নয়, কেননা নাটক নয়, আর্তনাদ নয়, শুধু নৈঃশব্দের মধ্য দিয়ে, শরীরকে স্তব্ধ ক'রে নৌকো ভাসাতে হয়। মাথার ভেতর যে সোনালি ঝর্ণা নেমে আসে, তা-ই বেতার তরঙ্গের মতো দূরে নিয়ন্ত্রণে ঐ নৌকো চালায়। কীভাবে চালায় হয়ত পাখিরা তা জানে, মাইল মাইল তুষারপ্রান্তরে রিজার্ভের তাড়া খেয়ে তারা উষ্ণমণ্ডলের দিকে চ'লে যায়:

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে/কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—/সাগরের তিতা ফেনা নয়,/খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়/এই জানিয়াছে;—

কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

আজ এই বসন্তের রাতে, তাই, শেখরের ঘুম নেই। সে জেগে আছে। □